উচ্ছ্বাস

আর্য্য-ধর্ম্ম-নিত্য-প্রণেতা

শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তি কাব্যরত্ন-

প্রণীত

CALCUTTA
PRINTED AND PUBLISHED BY R. DUTT
HARE PRESS
46, BECHU CHATTERJEE STREET
1907

মূল্য দুই আনা মাত্র।

উৎসর্গ পত্র

আর্য্য ধর্ম্মপরায়ণা সাবিত্রী সদৃশা

শ্রীল শ্রীমতী রাণী ভবানীপ্রিয়া

বড়ুয়ানী মহোদয়া

গৌরীপুরাধিরাজ্ঞী

করকমলে

উপহার স্বরূপ

এই পুস্তকখানি

অর্পিত হইল

উচ্ছ্বাস।

জাহ্নবী-তীরে।

পুণ্যসলিলা ভাগীরথী প্রাবৃটের নবাম্বুরাশিতে পরিপূর্ণা হইয়া টলমল করিতেছে। তটদ্বয় প্লাবিত হইয়াছে—নব-যৌবনের নূতন আনন্দ যেন উছলিয়া পড়িতেছে। কোনও স্থানে চিকিমিকি, কোনও স্থানে ঝিকিমিকি, অস্তোন্মুখ তপন মেঘের অন্তরালে অবস্থিত হইয়া, যেখান দিয়া ফাঁক পাইতেছে সেইখান দিয়াই তরঙ্গায়িত জলরাশির উপর ঐ মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছে। জলরাশি তরতর বেগে প্রবাহিত হইতেছে; অসংখ্য আবর্ত্তনিচয়—কলকল শব্দে এই নিভৃত স্থানের নীরব সঙ্গীত লহরীতে যেন তান প্রদান করিতেছে। নভোমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন; তটস্থ তরুরাজি

বায়ুভরে হেলিতেছে, দুলিতেছে, বোধ হইতেছে যেন মুগ্ধ হইয়া এই সুমধুর সঙ্গীতরস উপভোগ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে সায়ংকাল সমাগত হইল; সায়ংকাল উত্তীর্ণ হইয়া রজনী উপস্থিত হইল। মেঘাচ্ছন্ন গগন গাঢ় নীলিমায় পরিপূর্ণ হইল, জগৎ গভীর নিস্তব্ধতায় আবৃত হইল; অন্ধকার গাঢ় হইতেও গাঢতর হইয়া স্থাবর-জঙ্গমসঙ্কুল জগৎকে অতল বিস্মৃতিজলে নিমজ্জিত করিল। সম্মুখে তটিনী—তটিনীর কলকল শব্দ, তীরে দণ্ডায়মান আমি; যেন বোধ হইল জগতের অস্তিত্ব ক্ষণকালের জন্য আমাতে ও তটিনীতে পর্য্যবসিত হইয়া গেল। তরঙ্গিণীর তরঙ্গলহরীর সঙ্গে সঙ্গে আমারও হৃদয়ের চিন্তালহরী বহমান হইল, উচ্ছ্বাসবায়ু রহিয়া রহিয়া বহিতে লাগিল, উল্লাসের তরঙ্গ নাচিয়া উঠিল, প্রেমের আবর্ত্ত কলনিনাদে নাদিয়া উঠিল।

মাতঃ! শৈলসুতে! তুমি পতিতপাবনী, তুমি ত্রিভুবন-তারিণী। তোমার পবিত্র সলিলরাশি সংস্পর্শে কত পাপী উদ্ধার হইয়াছে, কত নরাধম ঘোর মহাপাতকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। এই পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত পবিত্র করিয়া, তুমি যুগ যুগান্তর প্রবাহিত হইতেছ; এই দেবভূমি বারাণসীক্ষেত্রের পাদমূল বিধৌত করিয়া, তুমি অনন্ত কাল চলিয়াছ; তোমারই তীরে, অদূরে ওই মণি-

কর্ণিকার মহাশ্মশান দিবানিশি জ্বলিতেছে, ওইখানে পাপীর পাপরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া যাইতেছে ; ওই শ্মশানে কত পাপাত্মা, কত নরাধম ভস্মাবশিষ্ট হইয়া, জগৎজননি ! শঙ্করমৌলিনিবাসিনি ! তোমার পবিত্র সলিলস্পর্শে উদ্ধার হইয়া যাইতেছে ; কাহারও শিবলোক প্রাপ্তি হইতেছে, কেহ স্বর্গাদি অতুল সুখসম্পদ প্রাপ্ত হইতেছেন, আর কেহ বা তন্ময় হইয়া, পরম নির্ব্বাণপদ লাভ করিতেছেন। তুমি সর্ব্বজনপূজনীয়া, তুমি সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িনী। যিনি তোমাকে যে ভাবে ডাকিতেছেন, মা ! তুমি তাঁহার নিকট সেইভাবে প্রকাশিত হইয়া,তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছ। ভক্তের নিকট তুমি পতিতপাবনী, মোক্ষদায়িনী ; কর্ম্মনিষ্ঠের নিকট স্বর্গাদি বিপুলঐশ্বর্য্যদায়িনী, আর জ্ঞানীর নিকট তুমি সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের আনন্দময় বিকাশ ! তোমার এই অনন্তশক্তিশালিনী অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশিবিভূষিতা মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া কেহ স্থির থাকিতে পারেনা ; ভক্তি ভরে তোমাকে পূজা করে, করপুটে তোমাকে প্রণাম করে, কি এক অনুপম অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে অনন্যমনে তোমারই পানে চাহিয়া থাকে।

মা ! ভক্ত, জ্ঞানী, কি কর্ম্মনিষ্ঠ, আমি কিছুই নহি ; এ পাষাণ হৃদয়ে ভক্তিরসের বিন্দুমাত্রও কখনও পতিত হয়

না ; সৎকর্ম্মের সৎসংকল্প ভ্রমেও কখনও মনোমধ্যে উদয় হয় না ; ঘোর অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন অন্তঃকরণে জ্ঞানদীপ মুহূর্ত্তের জন্যও কখন প্রজ্বলিত হয় না। কিন্তু কি জন্য বলিতে পারিনা, আমি যখন তোমার পানে তাকাই তোমার সৌন্দর্য্য রাশিতে বিমুগ্ধ হইয়া পড়ি ; তোমার জলরাশির অপূর্ব্ব গতি অবলোকন করিতে করিতে জ্ঞানহারা হইয়া পড়ি ; তোমার কুলুকুলু সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে কি এক অভাবনীয় সুখ অনুভব করি ; সংসার ভুলিয়া যাই, মনোমধ্যে উল্লাসের তরঙ্গ খেলিতে আরম্ভ করে, প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে, হৃদযতন্ত্রী বাজিয়া উঠে, চারিদিকে যেন অমৃতের উৎস ঝরঝরঝঙ্কারে বহিতে থাকে। মা! আমি এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য তোমাতে দেখিতে পাই। আমি তোমাকে এক অনুপম স্বর্গীয় রত্নে ভূষিতা দেখি ; যিনি যাহাই ভাবুন, আমার মতে মা। তোমার সেই রত্নটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন। সেই রত্ন আছে বলিয়া মা। তুমি আমার এত প্রিয—তোমার রূপরাশি অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হই, তোমাকে দেখিয়া পাগলের মত নৃত্য করিতে থাকি। তুমি তর তর বেগে চলিয়াছ, যুগ যুগান্তর এই ভাবে চলিতেছ ; দেশ দেশান্তর, নগর জনপদ, পর্ব্বত প্রান্তর অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিবাদে, নিষ্কণ্টকে, নির্ব্বিঘ্নে, নিরুদ্বেগে, প্রাণ যথা চাহিতেছে,

প্রেমরজ্জু যে দিকে টানিতেছে, হৃদযের চুম্বক শলাকা যে দিকে আকর্ষণ করিতেছে, সর্ব্ব বাধা অতিক্রম করিয়া, উন্নত গিরিশৃঙ্গ উল্লঙ্ঘন করিযা, নগর প্রান্তর প্লাবিত করিয়া, তুমি তুমুল বেগে সেদিকে ধাবিত হইতেছ। তোমার অভীষ্ট পথে কেহ কণ্টক দিতে পারিতেছে না, তোমার স্বাধীনতা ধন কেহ লোপ করিতে সক্ষম হইতেছেনা, মা! ইহাই দেখিয়া আমি আনন্দে মগ্ন হই। এই স্বর্গসুখস্বাধীনতা ধনে, তুমিই কেবল একমাত্র ধনী। সামান্য মানুষের কথা দূরে থাকুক, যোগী ঋষিরাও আজীবন চেষ্টা করিয়া কদাচ এই ধনে ধনী হন না, এ ধন দেবের দুর্লভ। যোগীরও ধ্যানভঙ্গ হয়, ইন্দ্রেরও ইন্দ্রত্ব যায়, দেবগণও সমযে সময়ে ভক্তের নিকট বন্দী হন, কিন্তু মা! তোমার ঐ পথের গতিরোধ কেহ কখনও করিতে পারে নাই। হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের সহিত, প্রাণের উল্লাসে, অবিরাম গতিতে তুমি গাহিতে গাহিতে নাচিতে নাচিতে এই আবহমানকাল চলিযাছ। হৃদযে আনন্দ যেন ধরিতেছেনা। যতই অগ্রসর হইতেছ ততই জীবনের উজ্জ্বল প্রভা তোমার নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই উৎসাহের তূর্য্যনিনাদ শ্রবণ করিতেছ, ততই আশার সুমধুর মুরলীধ্বনি তোমার কর্ণ-কুহর পরিতৃপ্ত করিতেছে। পশ্চাতের দিকে একবারও ফিরিয়া দেখিতেছ না, পশ্চাৎ হইতে কেহ তোমাকে

আকর্ষণও করিতেছে না। এমন ভাগ্য কয়জনের ঘটে? এরূপ অবিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা উপভোগ কযজন করিযা থাকে? আমরা মানুষ, সংসারের কীট; আমাদেব প্রত্যেকের জীবন এক একটী গণ্ডীব মধ্যে নিবদ্ধ। আপন আপন নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীব মধ্যে আমরা ঘুরিয়া বেড়াই; সেই গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াও একদিনের জন্যও নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ থাকিতে পারি না। আজ যে পথে চলিতেছি, কাল তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলিতে হইতেছে; আজ যে আশায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইতেছে, কাল তাহা ঘোর দুরাশায পবিণত হইতেছে, আজ যাহাকে পাইয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতেছি, কাল তাহাকে হারাইয়া হাহাকার কবিতেছি। জীবনের এই ক্ষুদ্র হ্রদে কত যে তরঙ্গ উঠিতেছে, কত যে আবর্ত্ত দেখা দিতেছে, কত যে তুমুল তুফান উঠিয়া জলরাশি আন্দোলিত করিতেছে তাহার পরিসীমা নাই। কুম্ভীপাক নরকের এই অত্যুষ্ণ জল রাশিতে পতিত হইয়া দিবানিশি ছটফট কবিতেছি, পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতেছি, তৃষিত চাতকের ন্যায় শান্তি-বারি পানের আশায় অহর্নিশ শান্তি! শান্তি! বলিয়া চীৎকার করিতেছি, কিন্তু শান্তি কোথায? সেই স্বর্গীয় সরোবর বহুদূরে অবস্থিত; সংসার গণ্ডী অতিক্রম করিতে না পারিলে তাহা পাইবার আশা নাই; কিন্তু হায়! এই

সংসার গণ্ডী অতিক্রম করি এমন ক্ষমতা কি আমাদের আছে? আমাদের এই গণ্ডী মধ্যে দগ্ধ হইতে হইবে, জন্ম জন্ম এইখানে পড়িয়া পড়িয়া পচিতে হইবে, আবার তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া এই বিষবারিই পান করিতে হইবে। মা! সংসারের এই ভীষণ যন্ত্রণার বিষয় যখন ভাবি, তখন জ্ঞান-হারা হই, অধীর হইয়া পড়ি, হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যায়, প্রাণ যেন অবসন্ন হইয়া পড়ে। ব্যাধির যন্ত্রণা, আত্মীয়ের বিচ্ছেদ, প্রণয়ে নৈরাশ্য, আশার নির্ম্মূলতা, স্বজনের বৈরিতা, বিষয়বাসনার ক্ষুদ্রাশয়তা, উচ্চাভিলাষের নৃশংসতা, লালসার প্রতারণা, অল্প বা অধিক পরিমাণে কে না সহ্য করিতেছেন? কে না এই ঘোর দুঃখ-দাবানলে দিবানিশি দগ্ধ হইতেছেন? কে না এই তীব্র গরল পান করিয়া, বিষম যন্ত্রণায় নিরন্তর নিপীড়িত হইতে-ছেন? ওই যে হতভাগ্য প্রাণপ্রতিমা প্রিয়তমার হৃদয়-হারিণী মূর্ত্তি খানি অনলে বিসর্জ্জন দিয়া হতাশ অন্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে; ওই যে দুরদৃষ্ট মুমূর্ষু পুত্রের ব্যাধি-ক্লিষ্ট মুখ খানি অবলোকন করিয়া, পুত্রের মৃত্যুকালোচ্চারিত নৈরাশ্যপূর্ণ উক্তি গুলি শ্রবণ করিয়া, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে; হায়! হায়! সে হতভাগ্য, একবারও ভাবে নাই যে তাহার প্রাণপ্রতিমা প্রিয়তমা তাহার জীবনকালেই তাহাকে অকূল দুঃখসাগরে

ভাসাইয়া চলিয়া যাইবে। হায়! হায়! সে কখনও স্বপ্নেও মনে করে নাই যে তাহার পুত্রের এই মুমূর্ষু অবস্থা তাহাকে নিজচক্ষে অবলোকন করিতে হইবে। এই লোমহর্ষণ ব্যাপার, এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য সংসার-গণ্ডীর মধ্যে নিয়ত ঘটিতেছে, এবং এই লইয়াই সংসার। পুড়িয়া ছাই হইবে, তথাপি পোড়াইতে ছাড়িবেনা; শোকে তাপে অভিভূত হইয়া অস্থির হইয়া পড়িবে, নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিবে তথাপি এ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে না। এ রাবণের চিতা চিরকাল জ্বলিবে। এ অগ্নির হস্ত হইতে কেহ ইচ্ছা করিলেই পরিত্রাণ পাইতে পারে না; পলাইয়া কেহ এই ভীষণ রাক্ষসের করাল কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হয় না। তুমি এক দিকে ধাবিত হইবে, তোমার গলদেশ-লম্বিত রজ্জু তোমাকে অন্যদিকে টানিয়া লইয়া যাইবে। প্রাণপণে ধাবিত হইবে, অদৃষ্ট তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া পুনরায় তোমাকে এই নরককুণ্ডে আনিয়া ডুবাইবে।

তাই বলিতেছিলাম মা! আমাদের স্বাধীনতা নাই; আমরা কল্পনা বলে কত কি দেখিতেছি, কত কি ভাবিতেছি, জীবনের সুখশান্তির কত মনোহর মূর্ত্তি মানস-চক্ষুর সম্মুখে আনিয়া উপনীত করিতেছি। কিন্তু হায়! তাহা ক্ষণস্থায়ী। "নিশার স্বপন সম" নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে

সঙ্গে সেই সুখ স্বপ্ন শূন্যে বিলীন হইয়া যায় ; তখন হাহা-কার ধ্বনি কর্ণ কুহরে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, ক্রন্দ-নের রব চারিদিক হইতে আসিতে থাকে ; কেহ পুত্র-শোকে অধীর হইয়া বক্ষঃস্থলে বিষম করাঘাত করিতেছে, কেহ প্রিয়তমার পবিত্র প্রণয়-বাশি স্মরণ করিয়া অশ্রু-জলে মেদিনী প্লাবিত করিতেছে, কেহ বাল্যকালে নিঃসহায় অবস্থায় পিতৃমাতৃবিয়োগকাতর হইয়া হতাশসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে ; বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া কেহবা হা। অন্ন। হা। অন্ন। বলিয়া নিরন্তর চীৎকার করি-তেছে। সংসার হইল না, সন্তানের মুখদর্শন লাভ করিলাম না, জগৎ শূন্যময় দেখিতেছি, পৃথিবী অন্ধকার মনে হইতেছে বলিয়া কোনও হতভাগা রোদন করিতেছে, কেন এ পাপ সংসারে প্রবেশ করিলাম, কেন সন্তান সন্ততি জন্ম গ্রহণ করিল, কেন সাধ করিয়া গরল পান করিলাম, বলিয়া অন্য হতভাগা অনুতাপ করিতেছে। এই কাতরধ্বনি মেদিনী ব্যাপিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ধনী বল, নির্ধনী বল, ভিখারী বল, নৃপতি বল, বালক বল, বৃদ্ধ বল আপামর সাধারণ সকলেই কাঁদিতেছে। এই মহাশ্মশানে সুখে কেহ নাই, এই নরককুণ্ডে মানবমণ্ডলী কেবল দিবা রাত্র দগ্ধ হইতেছে।

মায়াবিনী মরীচিকার ন্যায় কখনও কখনও সুখের

আভাস দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায় ; নরনারী উহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া তদভিমুখে ধাবিত হয়, ধরিবার জন্য হস্তপ্রসারিত করে, কিন্তু ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল-সমুদ্ভূত পদার্থের ন্যায় সে সুখাভাস শূন্যে বিলীন হইয়া যায় ; সকলে হতাশ অন্তঃকরণে ফিরিয়া আইসে।

দুঃখরূপ ঘোর অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন। খদ্যোতিকাপুঞ্জের ক্ষণস্থায়ী আলোকের ন্যায় মাঝে মাঝে এই দুঃখ সমুদ্রের মধ্যে সুখের লেশমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা প্রকৃত সুখ নহে ; জগতের লোক সেই সুখ লইয়াই পাগল। এই অকিঞ্চিৎকর সুখে সুখী মনে করিয়াই আমরা অহঙ্কারে মত্ত হই। কেহ ধনমদে মত্ত, কেহ মানমদে মত্ত, কেহ সৌন্দর্য্যমদে পাগল, কেহ যৌবনমদে পাগল ; কত রকমের পাগল দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সংখ্যা নাই ; কিন্তু পাগলেরা একবারও ভাবিয়া দেখে না, যে যাহা পাইয়া তাহাদের এত অহঙ্কার, সেই সুখসামগ্রী অন্তঃসারশূন্য ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া মাত্র।

মা ! আমরা পাগল। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি কলুষিত হইয়াছে ; আমরা প্রকৃত সুখসামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া অসার সুখের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি ; সংসাররূপ কুম্ভীপাক নরকে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাইতেছি ; ইহার

বিষম আবর্ত্তে পড়িয়া জন্ম জন্ম ভ্রমণ করিতেছি। আমরা চির পরাধীন। আমরা যাহা মনে করি তাহা করিতে পারি না, যাহা চাই তাহা পাই না। আমাদের হস্তপদ সর্ব্বদা শৃঙ্খলে আবদ্ধ, অদৃষ্ট চক্র আমাদিগকে যে দিকে ঘুরাইতেছে আমরা সেই দিকে ঘুরিতেছি; পিঞ্জরাবদ্ধ বন বিহঙ্গের ন্যায় আমাদিগকে যাহা দিতেছে তাহাই খাইতেছি, যাহা বলাইতেছে তাহাই বলিতেছি। এই পরাধীন জগতে মা! তুমিই একমাত্র স্বাধীন। দেবদেব মহাদেব যে দিবস পঞ্চজ্ঞানময় * পঞ্চমুখবিনিঃসৃত বীণাতন্ত্রীলযসম্বলিত সুমধুর জ্ঞানময় সঙ্গীত তোমাকে শ্রবণ করাইয়াছেন, সেই দিন হইতেই মা! তুমি এই স্বাধীনতাধন লাভ করিযাছ; সেই দিন হইতেই তোমার জ্ঞানপ্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, দ্বৈতভ্রম বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, মায়ার প্রবঞ্চনা সুদূরে পলায়ন করিয়াছে, অদৃষ্টগ্রন্থি খসিয়া পড়িয়াছে, প্রারব্ধ ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়াতে তুমি এই ঘোর যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছ। মা! সেই দেবদেব মহাদেবপ্রদত্ত জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে তুমিও আমাদের মত অহঙ্কারাদিসম্পন্ন ভগবান বিষ্ণুর কুক্ষিনিহিত একটি ভ্রমাত্মক অস্তিত্বে বর্ত্তমান ছিলে, গণ্ডীমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, জীবন রূপ ক্ষুদ্র হ্রদের তুফানে আলোড়িত হইতেছিলে; ত্রিপুরারির

* পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে মহাদেবের পঞ্চমুখ কল্পনা করা হইয়াছে।

জ্ঞানপূর্ণ সঙ্গীতলহরী যেই তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, অমনি দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল, ভ্রমান্ধকার দূরে পলায়ন করিল। তখন তুমি ভগবান বিষ্ণুর পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া অনন্তের পানে ধাবিত হইলে। স্বর্গ হইতে দেব দুন্দুভি নির্ঘোষিত হইল, অপ্সরাগণ পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিল, চারিদিকে আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হইল, দেবদেব মহাদেব স্বয়ং সেই আনন্দে আনন্দিত হইয়া তোমাকে মস্তকে করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। জ্ঞান-চক্ষু যাহার বিস্ফারিত হইয়াছে, মায়াবন্ধন যাহার ছিন্ন হইয়াছে, তাহার অবারিত গতি রোধ করে এমন সাধ্য কার? পথিমধ্যে কতজন কত চেষ্টা করিল, কেহ বিষম বাধা জন্মাইল, কেহ উদর মধ্যে নিহিত করিল, কিছুতেই তোমার অবিরাম গতি রোধ করিতে পারিল না। একবার যে হলাহলকে চিনিয়াছে, সে কি পুনরায় সে হলাহল পান করিয়া থাকে; একবার যাহার ভ্রমাত্মক সর্পকে রজ্জু বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে, সে কি পুনরায় কখনও সে রজ্জুকে দেখিয়া সর্প বলিয়া ভীত হইয়া থাকে? যে জ্ঞান ঋষির বাঞ্ছিত, যোগীর ধ্যেয়, দেবের প্রার্থনীয়, মা! জগদম্বে! দেবদেব মহাদেব তোমায় সেই জ্ঞান সঙ্গীত শ্রবণ করাইয়াছেন। তাই বলি মা! তুমি যে রত্নে ভূষিতা, এরত্ন দেবের দুর্লভ, যোগীন্দ্র ও মুনীন্দ্রগণবাঞ্ছিত। যিনি

তোমাকে যে ভাবে দেখুন, যে ভাবে পূজা করুন আমি কিন্তু তোমাতে আর অন্য কিছুই দেখিতে পাই না, আমি কেবল তোমাকে এই স্বর্গীয় রত্নে ভূষিতা দেখি, আমি তোমাতে সংসারকারাবাসবিমুক্ত পাপত্রয়বিধ্বস্ত, জীবন্মুক্তের প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শন করি। ইহজগতে জীবন্মুক্ত যদি কেহ থাকে, তবে মা! সে তুমি। আর কেহ এপদ লাভ করিতে পারিয়াছেন কিনা আমি জানি না। বেদে, পুরাণে, অনেক জীবন্মুক্তের নাম শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু জীবন্মুক্তের যদি কেহ জীবন্ত উদাহরণ দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে মা! তিনি তোমার ওই কলকলায়মান জলরাশির প্রতি, তরঙ্গবেগশালিনী ঊর্ম্মিমালার প্রতি একবার সতৃষ্ণ নয়নে অবলোকন করুন, জ্বলন্ত উদাহরণ দেখিতে পাইবেন। সুখদা, মোক্ষদা প্রভৃতি তোমার অনেক প্রকার নাম ভক্তবৃন্দের মুখে শুনিতে পাই, কিন্তু আমার নিকট তুমি মহাযোগী, মহাজ্ঞানী, পরমপদপ্রাপ্ত, পরম আনন্দে অনন্দিত, বিমুক্তাত্মা ভিন্ন আর কিছু নহ। তোমার ঐ কুলকুলকুল সুমধুর সঙ্গীত আমি যখনই শুনিতে পাই, তখনই আমার মনে হয়, উহা সাধকের মুখোচ্চারিত মনোহর সামগীতি। তুমি পরম সাধক, তুমি ঋষিশ্রেষ্ঠ, তুমি যোগীন্দ্র; লোকশিক্ষারজন্য, পতিতের উদ্ধারের জন্য, পরমজ্ঞানামৃত বিতরণের জন্য স্বর্গ

পরিত্যাগ করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণা হইয়াছ। আমরা যদি তোমার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিতাম, তুমি কে চিনিতে পারিতাম, তোমার বিতরিত জ্ঞানরাশি গ্রহণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আজ কখনও ত্রিকোটী কুলোদ্ধারের জন্য সংকল্প করিয়া তোমার পবিত্র সলিলে অবগাহন করিতাম না, ত্রিকোটী কুল অল্প কথা, তুমি অনন্তকোটীকুলোদ্ধারিণী, তুমি জীবের ভব-বন্ধনছেদন-কারিণী। তোমার এই কলকলনিনাদে উপনিষদের গভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, তোমার ওই অবিরাম গতিতে যোগীর যোগ-জীবনের জ্বলন্ত উদাহরণ দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু কে তাহা দেখিতে পায়? কয়জন তাহা বুঝিতে পারে? আমরা পাপী, আমরা নরাধম সে জ্ঞান আমরা কোথায় পাইব? সে জ্ঞানসঙ্গীত আমাদিগকে কে শুনাইবে? দেখিয়াও দেখিতেছি না, পুত্র, পরিবার, ঐশ্বর্য্য, সমস্তই মিথ্যা, ভ্রম মাত্র; বেদে ও বেদান্তে পড়িতেছি, জ্ঞানীর মুখে শুনিতেছি; কিন্তু ভ্রম হইলেও এ বিষম ভ্রম ত দূরীভূত হইতেছে না; এ দারুণ ভেল্কি ত একবারও ভেল্কি বলিয়া বোধ হইতেছে না। কে আমাদিগকে এই ভোজবাজীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবে? কে আমাদিগের কর্ণে সেই ভ্রম নিবারক মন্ত্র উচ্চারিত করিবে? কে আমাদিগকে সেই জ্ঞানরত্ন প্রদান

করিবে ? হাযবে। যদি আজ আমি সেই ধনে ধনী হইতাম, দেবদেব মহাদেব যদি কৃপা করিয়া আমাকেও সেই সঙ্গীত সুধা পান করাইতেন, তাহা হইলে মা! আজ তোমার ওই কলকল নিনাদী বারিরাশিতে এই অঙ্গ ঢালিযা দিয়া, তোমার সঙ্গে এক হইয়া চলিযা যাইতাম, তোমার আনন্দে আনন্দিত হইতাম, তোমার মত স্বাধীনতা লাভ করিয়া এই সংসারকারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিতাম! মাতঃ কলনিনাদিনি! তরলতরঙ্গিণি! শঙ্করমৌলিনিবাসিনি! ত্রিভুবনতারিণি! তুমি যুগযুগান্তর এই রূপে প্রবাহিত হও! তোমার মধুর সঙ্গীত অনন্তকাল এই রূপে জগতে প্রতিধ্বনিত হউক। যদিও আমরা তোমার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারি না, তোমার সঙ্গীতের গূঢ় মর্ম্ম মনোমধ্যে ধারণা করিতে পারি না, তথাপি যখন সংসারের দারুণ যন্ত্রণায উৎপীড়িত হইযা তোমার তীরে আসিয়া দণ্ডায়মান হই, তোমার কুল কুল কুল মধুর মুরলীরব শ্রবণ করি, তোমার অনন্ত সৌন্দর্য্য রাশি অবলোকন করি তখন কিছু না বুঝিতে পারিলেও, বোধ হয় যেন কি এক অমৃতরস পান করিতেছি; তাপিত প্রাণ সুশীতল হয, হৃদয় শান্তি-রসে আপ্লুত হয়। মা! এসুখটুকুও এ জগতে দুর্লভ।

ঊর্ণাভ।

ঐ বৃক্ষ-শাখায় ঊর্ণাভ জাল প্রস্তুত করিতেছে। মুখ হইতে সূত্র বাহির করিতেছে এবং শাখায় শাখায় সংলগ্ন করিয়া দিতেছে। অচিরাৎ দেখিতে পাইবে তাহার জাল প্রস্তুত করা শেষ হইয়া গিয়াছে, ঐ জালে তাহার আবাস স্থান হইয়াছে এবং উহাতে সে সংসার পাতিয়া বসিয়াছে, অচিরাৎ দেখিতে পাইবে কীট, পতঙ্গ, মক্ষিকা প্রভৃতি পথ ভ্রান্ত হইয়া সেই জালে আবদ্ধ হইতেছে এবং তাহাতে তাহার দৈনন্দিন সংসার যাত্রা অনায়াসে নির্ব্বাহ হইয়া যাইতেছে। ঊর্ণাভ আজ পরম আনন্দে আনন্দিত। সাংসারিক সুখ ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া সে পরম সুখে, সুখী হইবে, এই আনন্দ আজ তাহার রাখিবার স্থান নাই। তাহার চেষ্টা ফলবতী হইবে, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে একথা সে যতই

ভাবিতেছে, ততই অপার অমৃত সাগরে ভাসমান হই-তেছে। হায়! ঐ হতভাগ্য উর্ণনাভের এই আনন্দ যদি চিরস্থায়ী হইত, যদি সে অনন্ত কাল অবিচ্ছিন্ন রূপে এই সুখে সুখী হইতে পারিত তাহা হইলে আজ আমিও উহার আনন্দে আনন্দিত হইয়া, উহারই সঙ্গে একতানে এই আনন্দের গান গাহিতাম। উর্ণনাভের হৃদয় সরল ও অকপট। সংসারের দারুণ বিভীষিকার চিত্র, পরিণামের ভীষণ দুশ্চিন্তা, উহার ঐ ক্ষুদ্র হৃদয়টীতে ক্ষণকালের জন্যও স্থান প্রাপ্ত হয় না, আমার মত সে সংসারের অনলে দগ্ধ হইয়া কপটতারূপ বিষময় শিক্ষা লাভ করিতে পারে নাই। আমি সুখ দেখিলেই তাহার পরিণামের বিষয় চিন্তা করি সে তাহা করে না। আমি অভিজ্ঞ সে অন-ভিজ্ঞ;—তাই সে পরম আনন্দে আনন্দিত; আর আমি তাহার আনন্দ দেখিয়া পরম দুঃখে দুঃখিত !!

আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, কিছুদিন পরে ঐ উর্ণনাভের সুখ ও শান্তি কিছুই থাকিবে না, কিছুদিন পরে সে একটী ডিম্ব প্রসব করিবে, সেই ডিম্বের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া উর্ণনাভ আপনার সর্ব্বনাশ আপনি আনয়ন করিবে। ডিম্বটীকে সে পরম আদরে অতি যত্নে সর্ব্বদা বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবে, ক্ষণকালের জন্য উহাকে হৃদয়স্থল-চ্যুত করিবে না, এদিকে ডিম্বমধ্যস্থ সন্তান সন্ততিগণ

ক্রমে ক্রমে পরিপকতা লাভ করিয়া যখন তাহাদের বহির্গত হইবার সময় উপস্থিত হইবে তখন তাহারা এই মাতৃস্নেহের প্রতিদান স্বরূপ মাতৃবক্ষঃ বিদাবণ করিয়া বাহিরে নির্গত হইবে ; দুর্ভাগ্য ঊর্ণনাভের শবদেহ শুষ্ক ও জীর্ণ অবস্থায় তাহার নিজকৃত জালে ঝুলিতে থাকিবে ! ! ঊর্ণনাভের এত আশা, এত সুখ, এত আনন্দ এইখানেই শেষ হইয়া যাইবে। হায় ! হায় ! নির্ব্বোধ ঊর্ণনাভ ! তুমি কি করিতেছ ? নশ্বর সুখভোগেব কল্পনায় মত্ত হইয়া পরিণামেব বিষয় কি একবারও ভাবিতেছ না ? আপনার সর্ব্বনাশের পথ যে আপনি পরিষ্কার করিতেছ, আপনাব মৃত্যুর অস্ত্র যে আপনি নির্ম্মাণ করিতেছ, এ চিন্তা কি তোমার হৃদয়ে একবারও স্থান প্রাপ্ত হইতেছে না ? মনে করিতেছ তুমি এই সুখে চিরকাল সুখী হইবে ; এই সুখ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে অনন্ত সুখসাগরে লইয়া যাইবে। ধন্য মা ! মহামায়া ! এ অনন্ত মহিমা, এ অমানুষিক ক্রীড়ার গভীর মর্ম্ম বুঝিতে পারে এমন সাধ্য কার ? যে মরিতেছে তাহাকেও দেখিতেছি, যে কষ্ট পাইতেছে তাহার বিষয়ও জানিতেছি ; কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও আবাব সেই মৃত্যুব পথই অন্বেষণ করিতেছি। ঊর্ণনাভ যে একাই এই বিষম ভ্রমে পতিত হইয়া নিজের বিনাশ নিজে সাধন করিতেছে এমন নহে ;

আমরাও প্রত্যেকে এক একটী উর্ণনাভ। ঐ উর্ণনাভ যেমন মায়া জালে আবদ্ধ হইয়া পরম স্নেহের পাত্র সন্ততিগণ কর্তৃক ভক্ষিত হয়, আমরাও সেইরূপ হই। আমরাও ঐ উর্ণনাভের মত সংসার-বাগুরা পাতি, পুত্র, পরিবার ও আত্মীয়গণে পবিবেষ্টিত হই; হৃদয় মধ্যে কত সুখের কল্পনা, আনন্দেব তুফান উঠিতে থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু হায়! এই সুখ, ও এই আনন্দের পরিণামে কি হয়? সুখের আশায়ই জীবন কাটিয়া যায, সুখ কদাপি হয় না, চাতকের মত সুশীতল বাবি বিন্দুব জন্য উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করি কখনও তাহা পাই না; অন্ধকার অমানিশায় পথভ্রান্ত পথিকের মত পথ অন্বেষণ করিয়া বেড়াই, পথ কখনও খুজিয়া পাই না, বিপথে গমন করি, কণ্টকাবৃত গভীর গহ্বরে যাইয়া পতিত হই। কে এ সংসারে সুখী? কাহাকেও ত সুখী দেখিতেছি না। ছোট বড় কেহই একদিনের জন্যও সুখী নহে। সকলে আপন আপন চিন্তায মগ্ন ও আপন আপন দুঃখে অভিভূত। চিন্তার ডালি প্রত্যেকের মস্তকে। যত দিন সে জীবিত থাকিবে, ততদিন এই চিন্তাসহচবী, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিবে, মরিয়া গেলেও করিবে কি না একথা কে বলিতে পারে? যখন আমরা ধরাধামে অবতরণ করি তখন চিন্তা উৎকণ্ঠার বিষয় কিছুই থাকে না কেবল সরল প্রাণটী মাত্র থাকে।

সে প্রাণ যাহা পায়, তাহাতে পরম সুখী মনে করে, যাহা দেখে, তাহাতে অপার আনন্দ অনুভব করে। একটী প্রস্তর খণ্ড কুড়াইয়া পাইলেও সে অপার আনন্দ সাগরে ভাসমান হয়, একটী পাখীকে উড়িয়া যাইতে দেখিলেও সে মুগ্ধ হইয়া তাহারই পানে তাকাইযা থাকে। তাহার জীবনে নৈরাশ্য নাই, কারণ সে যাহা পায় তাহাই তাহার নিজের মনে করে, যাহা পায় না তাহা পাইবার জন্য চেষ্টাও করে না, তাহার বিষয় ভুলিয়া যায়। চক্ষু ফিরাইলে পশ্চাতের বিষয় আর তাহার মন আকর্ষণ করে না। যাহা গিয়াছে তাহার জন্য তাহার কোন দুঃখ নাই, কারণ যাহা পায় তাহারই সৌন্দর্য্যে তাহার মন বিহ্বল হইয়া পড়ে। আশারাক্ষসী তাহাকে কখনও প্রতারিত করিতে পারে না, ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনা কদাপি তাহার মনোমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় না, বর্ত্তমানে যাহার কোন অভাব নাই ভবিষ্যতের কথা সে ভাবিতে যাইবে কেন? জগতের প্রত্যেক পদার্থ তাহার নিকট স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে বিভূষিত; বিষ ও অমৃতে তাহার সমান স্পৃহা, শত্রু ও মিত্রে তাহার একই ভাব। একটী সর্পকে দেখিলেও সে সাদরে আলিঙ্গন করিতে যায়, একটী অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন পদার্থকেও সে অমৃত মনে করিয়া মুখে তুলিয়া দেয়।

এই বিশুদ্ধ ও সরল ভাব যাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিদ্যমান,

তাহার কিসের অভাব? কোন বস্তুটী না পাইয়া সে কাঁদিয়া বেড়াইবে? কোন বস্তুটী হারাইয়া সে শোক-সাগরে নিমগ্ন হইবে? সে ত যাহা চাহিতেছে তাহাই পাই-তেছে, যাহা হারাইতেছে তাহাই আবার লাভ করিতেছে। কোন বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষে ত তাহার অনুরাগ নাই কিন্তু জগতের যাবতীয় পদার্থই তাহার অনুরাগ উদ্দীপিত করিয়া থাকে। যে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে সে জগৎকে শোভিত দেখে, সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য, সে তৃণ হইতে মণিমুক্তা পর্য্যন্ত প্রত্যেক বস্তুতে দেখিতে পায়। সেই সৌন্দর্য্যই তাহার মন আকর্ষণ করে এবং তাহাই ধরিবার জন্য সে বিভোর হইয়া ধাবিত হয়। বস্তু তাহার লক্ষ্য নহে কিন্তু বস্তুমধ্যগত সৌন্দর্য্যই তাহার লক্ষ্য।

এই অকৃত্রিম ও সরল ভাবটী যখন মনুষ্য হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে তখনই মানুষ প্রকৃত মানুষ! কিন্তু হায়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ভাব আর থাকে না, আস্তে আস্তে শরদের প্রারম্ভে ভরা নদীর জলের ন্যায় সেই ভাবটী তিরোহিত হইয়া যায় তখন আমরা প্রকৃত সৌন্দর্য্য ভুলিয়া গিযা অপ্রকৃত সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইতে আরম্ভ করি, ইতিপূর্ব্বে যে সৌন্দর্য্যে জগৎকে রঞ্জিত দেখিতাম তাহা আর দেখি না। আমাদের অনুরাগ তখন জগতের কোন বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষে নিপতিত হয়, সেই বস্তুই আমাদের

একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়ে। তাহাকে পাইবার জন্য চেষ্টা করি, তাহাকে পাইলে কিছু দিনের জন্য আনন্দিত হই, না পাইলে কিম্বা পাইয়া হারাইলে দারুণ শোকে অভিভূত হই। যেদিন হইতে মনুষ্য হৃদয়ে এই অপ্রকৃত ও অসরল ভাবের সঞ্চার হয়, সেই দিন হইতে তাহার দুঃখ-যামিনীর সূত্রপাত হয়, সেই দিন হইতে তাহার হৃদয়ে আশা, নৈরাশ্য, মত্ততা, দ্বেষ, হিংসা, নৃশংসতা, মোহ প্রভৃতি দুর্দান্ত রাক্ষসগণ ক্রমে ক্রমে আসিযা আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই দিন হইতে সে ঐ হতভাগ্য ঊর্ণনাভের মত আপনার মৃত্যুর জাল আপনি পাতিতে আরম্ভ করিয়া পরিণামে উহারই মত অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। তখন তাহার সন্তান সন্ততিগণ,তাহার প্রিয়তম ব্যক্তিগণ, যাহাদের জন্য সে এই সংসার বাগুরা পাতিয়াছিল, যাহাদিগকে পাইয়া সুখী হইবে বলিয়া সে কায়মনোবাক্যে কামনা করিয়াছিল, যাহাদের সুখে ও শান্তিতে দিনাতিপাত হইবে বলিয়া সে অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছিল, প্রাণপণ করিয়া কঠোর পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিল, বলিতে গেলে দুঃখাশ্রু বিগলিত হয়, কণ্ঠরোধ হইয়া আইসে, তাহারাই—সেই প্রিয়তম ব্যক্তিগণই, তাহার জীবন কাল শেষ করিয়া দেয়—তাহার হৃদয় বিদারণ করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করে।

হায়! হায়! হতভাগ্য পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে ছাড়িতে যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সাদরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে!

তাই বলিতেছিলাম সুখের আশায় সংসার; সুখ কখন হয না আশাযই ইহার শেষ। যাহাব অর্থ নাই, কি প্রকারে অর্থোপার্জ্জন কবিব, কিপ্রকারে সংসার চালাইব, পরিজনগণের দিন কি প্রকারে সুখে ও শান্তিতে অতিবাহিত হইবে, সে এই চিন্তায় মগ্ন, আবাব যাহার বিপুল অর্থ, সে কিপ্রকারে আমার দিন নিরাপদে কাটিয়া যায়, আত্মীযের বিচ্ছেদ দেখিতে না হয়, সকলে ব্যাধিশূন্য হইয়া সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে জীবিত থাকে, সর্ব্বদা এই ভাবনায় ব্যাকুল। আশানুরূপ ফলপ্রাপ্তি কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, আধি, ব্যাধি, জন্ম, মৃত্যু, সংসারে নিয়ত ঘটিতেছে চিরদিন ঘটিবে; মানুষও সেই যন্ত্রণায় অনন্তকাল দগ্ধ হইবে। আশা কখনও পূর্ণ হইবে না, যন্ত্রণার কখনও উপশম হইবে না, চিন্তার চিন্তায় মন অবসন্ন হইয়া পড়িবে, দেহযষ্টি ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইবে, অবশেষে ঐ ঊর্ণনাভের মত দুর্ভাগ্য মানব অকালে প্রাণত্যাগ করিয়া শান্তি লাভ করিবে!

তাই বলি ইহ জগতে অনেক ঊর্ণনাভ আছে। আজ ঐ ঊর্ণনাভের কার্য্যকলাপ দেখিয়া হাসিতেছি, তাহার

পরিণামের বিষয় চিন্তা করিয়া তাহাকে মহামূর্খ মনে করিতেছি, কিন্তু আমরাও যে প্রত্যেকে উহার মত বিষম ভ্রমে পতিত হইয়া আপনাদের মূর্খতার পরিচয় প্রদান করিতেছি, উহারই মত আপনাদের সর্ব্বনাশের ফাঁদ আপনারা পাতিতেছি, আপনাদের বন্ধনেব শৃঙ্খল আপনারা পরিতেছি, অমৃত মনে করিযা বিষভাণ্ড সঞ্চয় করিতেছি, মৃত্যুকে সাদরে আহ্বান করিতেছি একথা একবারও ভাবিতেছি না, এ ভ্রম কিছুতেই দূর করিতে পারিতেছি না, এ মূর্খতা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতেছি না। ঊর্ণনাভের ক্ষুদ্র জীবনের ইতিবৃত্ত আমাদের বৃহৎ জীবনের একটী অভিনয় মাত্র। যাহা আমরা, ঊর্ণনাভও তাহাই। আমরা যাহা করি ঊর্ণনাভও তাহাই করে। নাট্যাভিনযে যেমন বহুকালব্যাপী ঘটনা সমূহ একত্রিত অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে প্রদর্শিত হয়, ঊর্ণনাভের ক্ষুদ্র জীবনের ইতিবৃত্তও সেইরূপ মনুষ্য জীবনের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ব্যাপী ঘটনাবলীও অল্প সময়ের মধ্যে অভিনয় করে। নির্ব্বোধ মানব! তুমি পুত্র পরিজন পরিবেষ্টিত হইয়া, ঐশ্বর্য্য সুখে মত্ত হইয়া পরিণাম চিন্তা করিতেছ না; কিছু দিন পরে তুমিও ঐ ঊর্ণনাভের মত পুত্র পরিজন কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবে, এই অভিনয় আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিতেছে। মতি স্থির কর, চঞ্চলতা দূর কর, মত্ততা পরিত্যাগ কর, মায়াজালে আর মুগ্ধ হইওনা।

নিজের মূর্খতার বিষয় একবার ভাব, ঐ অভিনয় সন্দর্শন কর, উহা হইতে শিক্ষালাভ কর এবং যাহা সৎ, যাহা চির-স্থায়ী, যাহার পরিণামে অনন্ত সুখ সেই পথে ধাবিত হও। সংসার খেলা আর কত দিন খেলিবে? খেলা ভাঙ্গিয়া দাও, তোমার সমস্ত ভ্রম দূরে চলিয়া যাইবে। এই সংসার ক্ষেত্র একটী শতবঞ্চ খেলার গৃহ। তুমি যখন খেলা করিতে ব'স তখন তোমার পক্ষের রাজা মন্ত্রী প্রভৃতি ক্রীড়াপুত্তলি-গুলিকে কখনও অকিঞ্চিৎকর সামান্য পদার্থ মনে করিতে পার না, তখন তোমার মনে হয়, ক্রীড়া-গৃহস্থ রাজা, মন্ত্রী, অশ্ব, গজ, প্রভৃতি প্রত্যেকে এক একটী জীবিত পদার্থ। তাহাদের মৃত্যু তোমার বক্ষঃস্থলে যেন শেল প্রদান করে, তাহাদের এক একটীর বিরুদ্ধে এক একটী চাল তোমাকে ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন করে, যেন বোধ হয় তোমার রাজ্য জয়-করিতে বিপক্ষগণ আক্রমণ করিতে আসিতেছে; এই আক্রমণের হস্ত হইতে মুক্ত পাইবার জন্য তুমি ভযানক চিন্তিত হও, যেন মনে কর এ আক্রমণ নিবারণ করিতে না পারিলে তুমি সত্যই রাজ্যধন হইতে বঞ্চিত হইবে, তুমি পথের ভিখারী হইবে; তখন ক্ষণকালের জন্য তুমি আত্মহারা হইয়া, অন্য চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া, আত্মীয় স্বজনকে বিস্মৃত হইয়া ক্রীড়া পুত্তলিগুলি ও ক্রীড়া-প্রকোষ্ঠ কয়েকটীর চিন্তায় মনপ্রাণ সমর্পণ কর। আবার এই

খেলা যখন ভাঙ্গিয়া দাও তখন তোমার রাজ্য ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি কিছুই থাকে না। তখন তুমি যেই মানুষ পুনরায় সেই মানুষ হও, তোমার রাজা, মন্ত্রী, অশ্ব, গজ প্রভৃতি তখন অকিঞ্চিৎকর সামান্য ক্রীড়াপুত্তলিতে পরিণত হয়।

সংসার-শতরঞ্চ খেলাও ঐরূপ। আমাদের আবাস স্থান এই খেলার ক্রীড়াগৃহ; আর আমাদের পুত্রপরিজনগণ ইহার ক্রীড়া পুত্তলি। প্রকৃতির সঙ্গে আমরা এই খেলা খেলিতেছি। প্রকৃতি অন্তরালে থাকিয়া এক একটী চাল দিতেছেন আর আমরা ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছি। কখনও ব'ড়ের উপর আক্রমণ হইতেছে, কখনও বা মন্ত্রীকে ধরিয়া কীস্তি দিতেছে; কখনও মন্ত্রীর প্রাণ নাশ করিতেছে কখনও বা সর্ব্বস্বান্ত করিয়া গজচক্রে ঘুরাইতেছে। কাহারও কাহারও এক চালে বাজি মাৎ, কেহ কেহ বা পঞ্চরঙ্গের পঞ্চকিস্তীতে নিকাশ। বাজিও সাঙ্গ হয় জীবনও শেষ হইয়া যায়। সমস্তই বুঝিতেছি কিন্তু ছাড়িতে পারিতেছি কৈ? সেই ক্রীড়াপুত্তলিগুলির মায়া ত ছাড়িতে পারিতেছি না। সেই মায়ায় মুগ্ধ হইয়াইত এই সংসার খেলা খেলিতেছি। শরীরের যত শক্তি, মনের যত বুদ্ধি সমস্তই এই বৃথা ক্রীড়ায় নষ্ট করিতেছি। এই ক্রীড়ার

শরীর যাইবে, মন যাইবে, মনুষ্যত্ব যাইবে, সর্ব্বস্বান্ত হইব, অবশেষে প্রিয়তম প্রাণকেও হারাইব তথাপি এ ক্রীড়া ছাড়িব না। আজ ঐ হতভাগ্য ঊর্ণনাভের ভ্রমবুদ্ধি দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি; কিন্তু নিজে কি করিতেছি তাহা কি একবারও ভাবি ?

হায়! হায়! মানব কবে তোমার এ ভ্রান্তি দূরে যাইবে ? কবে তুমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিবে ? কবে তুমি এই ভবের খেলা সাঙ্গ করিবে ? দিন যে গেল, বেলা যে অবসান হইল, দুঃখ-যামিনীর গাঢ় অন্ধকার যে ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আসিল, আর কেন ? যথেষ্ট হইয়াছে। অনেক খেলা খেলিযাছ, এবারে খেলা ভাঙ্গিয়া দাও, যাহা সৎ, যাহা পরম প্রেমাস্পদ যাহা তোমার জীবনের একমাত্র বাঞ্ছনীয়, একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই পথে অগ্রসর হও, অনন্ত সুখ অন্বেষণ কর, অপার আনন্দজলধির পথে ধাবিত হও।

অস্ফুট স্মৃতি।

আইসে, আবার চলিয়া যায়। শুষ্ক মরুভূমিতে বারি-বিন্দু পতিত হয়—পতিত হইবামাত্র আবার শুকাইয়া যায়। স্বপ্নের মত স্মৃতিপথে উদয় হয়, দেখিতে দেখিতে অতীতের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যায়। ধরিতে চাই, ধরিতে পারিনা—ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করি; সুদূরে পলায়ন করে। ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণকালের জন্য আমার অন্তর্জগত আলোকিত করিয়া কোথায় যে চলিয়া যায় আর দেখিতে পাই না।

সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর, দূরে অনন্ত পর্ব্বতমালা অনন্ত রাজ্যের দিকে চলিয়া গিয়াছে; মলয় মারুত বহিতেছে, বিহঙ্গকুল গাহিতেছে, কুসুম সৌরভ দশদিকে বিস্তৃত হইতেছে, উচ্ছ্বাসে জগৎ হাসিয়া উঠিতেছে। এই উচ্ছ্বাস লহরীর সম্মুখে যখন দণ্ডায়মান হই, যখন ঐ বিস্তৃত প্রান্তরের অনুপম সৌন্দর্য্য রাশি আসিয়া আমার হৃদয়

কবাটকে আঘাত করিতে আরম্ভ করে, যখন ঐ অনন্ত শৈলশ্রেণী পদ্মিরাজ্যের স্বপ্ন-প্রবাহ লইয়া আমার হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ করিতে থাকে, তখন কি এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গসুখ অনুভব করি, ক্ষণকালের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ি, প্রাণের দ্বার যেন খুলিয়া যায়, হৃদয়তন্ত্রী যেন বাজিয়া উঠে, শরীর পুলকিত হয়, মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্য-রাশি আসিয়া আমার মানসপটে প্রতিফলিত হয়। তখন কুসুম-সৌরভে মাতওয়ারা হই, মলয় মারুত সংস্পর্শে অমৃত সুখ অনুভব করি, তটিনীর কুল কুল নিনাদে, প্রেমের বাঁশরী শুনিতে পাই, ভ্রমর-ঝঙ্কারে, কোকিলের কুহুরবে নন্দন-কানন সমুত্থিত সুমধুর সুর-সঙ্গীত শ্রবণ-সুখ অনুভব করি, শারদীয় পূর্ণ সুধাকরের জ্যোৎস্না রাশি যেন আমার নিকটে পীযূষ-সাগর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অসংখ্য নক্ষত্রমালা পরিশোভিত নীল নভস্তল যেন এই অপার আনন্দধামের চন্দ্রাতপের অভিনয় করে; শ্যামলশষ্পবীথিসুশোভিত প্রান্তর যেন কি এক বৈদ্যুতিক প্রভায় রঞ্জিত হয়, শৈলশ্রেণী যেন কি এক হৃদয় উন্মাদক অজ্ঞেয় ভাব ধারণ করে; তখন শিশুর হাসিতে, কবিতার কমনীয় পদাবলীতে, প্রেমের সঙ্গীতে যেন অমৃতের ভাণ্ডার দেখিতে পাই; তখন জগৎ দেখিনা কেবল সৌন্দর্য্য দেখি, সেই সৌন্দর্য্য পারাবারে ভাসমান

হই, উহার স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দেই—তখন আমি আর আমি থাকি না। ঐ সৌন্দর্য্য-পারাবারের একটী বারিবিন্দুতে পরিণত হই ; কিন্তু আইসে আবার চলিয়া যায়। এই সৌন্দর্য্য দেখি, এই আনন্দ উপভোগ করি কিন্তু প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারি না। সমুদ্রের তবঙ্গের মত আইসে, আমার অন্তঃকরণরূপ বেলাভূমি প্লাবিত কবে, আবার চলিযা যায়। সেই পর্ব্বত, সেই প্রান্তর সমস্তই বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যে সৌন্দর্য্য রাশি আসিযা উহাদিগকে রঞ্জিত করিয়াছিল, আমার হৃদয়-জলধি আলোড়িত করিয়াছিল, আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল তাহা আর থাকে না ; তখন শিশিরে পত্রবিহীন বৃক্ষের মত,মাংসচর্ম্মাদিবর্জ্জিত কঙ্কাল বিশিষ্ট জীবদেহের মত, এই জগৎটী মাত্র দেখি। চারি দিকে শূন্যময় মনে হয়—হৃদয় আবার নৈরাশ্য-সাগরের অতল জলে ডুবিয়া যায়।

জীবনের পথে যতই অগ্রসর হইতেছি, এই সৌন্দর্য্যরাশির উপভোগ হইতে ততই বঞ্চিত হইতেছি। একদিন জগতের এই রূপমাধুরী আমার জীবনের চিরসঙ্গিনী ছিল। একদিন আমি এই রূপরাশিতে বিমুগ্ধ হইয়া অনুপম আনন্দে দিবানিশি অতিবাহিত করিতাম, হায় রে ! শৈশবের সে ভাব কোথায় চলিয়া গেল। চন্দ্রমা দেখিয়া বিভোর হইয়া তাহারই পানে তাকাইয়া থাকিতাম, আয় আয় বলিয়া

ডাকিতাম, ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিতাম। আকাশে মেঘ দেখিলে আনন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিতাম, পাখীর গান শুনিলে তাহারই সঙ্গে গলা মিশাইয়া গাহিতাম, যাহাই দেখিতাম প্রেমভরে তাহারই পানে ধাবিত হইতাম, তাহাতে এক আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতাম। শত্রু ও মিত্রে, বিষ ও অমৃতে কোন প্রভেদ ছিল না। কেহ হিতকারী কেহ অহিতকারী মনে হইত না, কেহ নীচ কেহ উচ্চ এ জ্ঞান মনোমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইত না, জগতের পানে তাকাইতাম আব বোধ হইত যেন ইহা এক অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত। আমার চারিদিকে যেন সৌন্দর্য্যের প্রবাহ বহিয়া যাইত, রূপেব ছটা ঝকমক্ করিতে থাকিত, প্রেমের উচ্ছ্বাস উথলিয়া পড়িত।

সে ভাব তখন ছিল এখন আর নাই। শৈশব উত্তীর্ণ হইয়া কৈশোরে পতিত হইয়া সে ভাব হারাইতে আরম্ভ করি, কিন্তু তখনও কিছু ছিল। এই সৌন্দর্য্য বিহীনতা, এই শুষ্ক মরুভূমিসদৃশ, তখন একদিনের জন্যও অনুভব করি নাই। তখনও মলয়ের হিল্লোল সংস্পর্শে উল্লাসে পরিপূর্ণ হইতাম, কুসুম কাননের রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিয়া বিমোহিত হইতাম, নিবিড় প্রান্তরের অপূর্ব্ব ভাব, বন-তরুরাজি পরিশোভিত পর্ব্বতমালার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মনোহারিতা অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইতাম; উন্মাদের

ন্যায় ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতাম, দেখিয়া কখনও আশা মিটিত না, ভোগ করিয়া কখনও বীতরাগতা আসিত না, ভ্রমণ করিয়া কখনও ক্লান্তি অনুভব করিতাম না। নব বসন্ত সমাগমে যখন বনরাজি কুসুম পল্লবে সুশোভিত হইত, যখন শিরীষ ও চম্পকের সৌরভে দশদিক্ সুবাসিত হইত, যখন পলাশকুসুমে গিবিবন রঞ্জিত হইত, যখন পাপিয়া ডাকিত, ভ্রমর গুঞ্জন করিত, কোকিল পঞ্চস্বরে জগৎ মাতাইত, তখন ক্ষণকালের জন্য স্থির থাকিতে পারিতাম না, তখন বিপুল উল্লাসে উল্লাসিত হইতাম; প্রান্তরে প্রান্তরে বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতাম; কিসের জন্য ভ্রমণ করিতাম জানিনা; কোন মোহিনী শক্তি আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিত বুঝিতাম না; অথচ লক্ষ্যবিহীন হইয়া উদ্দেশ্যশূন্য হইয়া ধাবিত হইতাম। সংসারের বিষয় কিছুই ভাবিতাম না, ভবিষ্যতের ভাবনা কদাপি মনোমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইত না, সরল চিত্তটী আমার তখন যাহা পাইত, তাহাতে মত্ত হইয়া থাকিত, পরম সুখে দিন অতিবাহিত হইত।

যে হাসিয়া কথা কহিত তাহাকে বন্ধু মনে করিতাম, হাসির মধ্যে যে কৃত্রিমতা থাকে, আত্মীয়তার ভিতরে যে স্বার্থপরতা থাকে, সরলতায় যে অসরলতা থাকে, মানুষ, মুখে অমৃত মাখিয়া যে অন্তরে গরল পুষিতে পারে একথা

তখন বুঝিতে পারিতাম না। কৈশোর অতিবাহিত হইয়া যখন যৌবনে পদার্পণ করিয়া ছিলাম, যখন মত্ততা আসিয়া ছিল, যখন কৃত্রিম সুখেব কল্পনা আসিয়াছিল, যখন স্বার্থ-চিন্তার তরঙ্গ উঠিয়াছিল, যখন ব্যক্তি বিশেষের রূপে মোহিত হইতে শিখিয়াছিলাম, যখন প্রণয়িণীর হাসি রাশিতে অমৃতেব মাধুরী দেখিতে পাইতাম, যখন রমণীপ্রণয়ে স্বর্গসুখ অনুভব করিতাম, ঐশ্বর্য্য সুখকে চরম সুখ ভাবিতাম,—একথা তখন বুঝিয়াছিলাম। তখন বন্ধুতায প্রতাবণা প্রাপ্ত হইযাছিলাম, মধুর বাক্যে ভুলিয়া অশেষ যন্ত্রণায পতিত হইযা ছিলাম, প্রাণ সমর্পণ করিতে গিয়া তাহার প্রতিদানস্বরূপ অসরলতা ও স্বার্থপরতা প্রাপ্ত হইযাছিলাম, প্রণয সাগবে সন্তবণ করিয়া দারুণ বিষেব জ্বালায় ছটফট কবিযাছিলাম, ঐশ্বর্য্য সুখে মত্ত হইযা প্রকৃত সুখ হারাইযা পৈশাচিক অবস্থাপন্ন হইয়া-ছিলাম, কালকূটে অন্তর ভবিয়া গিযাছিল, দ্বেষ, হিংসা, লোভ ও মোহের উত্তেজনায় শরীব জর্জ্জরিত হইয়াছিল।

যৌবন হইতে আরম্ভ করিযা আজ পর্য্যন্ত এই ভাব—এই আধ্যাত্মিক সংকীর্ণতা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি একটী পিশাচে পরিণত হইয়াছি। এখন সরল মনে কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে পারি না, সরলচিত্তে কাহাবও দুঃখের কাহিনী কি সুখেব সংবাদ শ্রবণ করিতে

পারি না, পবিত্র নয়নে কাহারও পানে তাকাইতে পারি না, স্বার্থশূন্য হইয়া কোন কার্য্যই করিতে পারি না ; প্রাণ ভরিয়া কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারি না, নির্ভযে কাহারও নিকটে যাইতে পারি না, পদে পদে বিপদ দেখি, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মৃত্যুর ভয় করি ; চিন্তায় চিন্তায় শরীর ও মন জীর্ণ শীর্ণ হইযাছে ; যেন বোধ হইতেছে ব্রহ্মাণ্ড আমার বিরুদ্ধে চলিয়াছে, জগতেব প্রত্যেক বস্তু যেন আমার অনিষ্ট সাধনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। অন্নে শঙ্কা, পানে শঙ্কা, শয়নে শঙ্কা, গমনে শঙ্কা,হাসিতে শঙ্কা, কান্নায শঙ্কা—জগৎ শঙ্কায় পরিপূর্ণ। সম্প্রতি আমি এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আমি কি একাই ভোগ করিতেছি ?—

শৈশব কাল আমাদের জীবনের কেন্দ্রস্থল। আমরা যখন সেই কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করি তখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকি, তখন সরলতা, প্রেম, আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। সেই কেন্দ্রস্থল হইতে পরিধির দিকে যতই অগ্রসর হই, স্বাভাবিক হইতে ক্রমে অস্বাভাবিকে আসিয়া উপস্থিত হই, সরলতা দূরীভূত হয়, অসরলতার রাজ্য বিস্তৃত হয় , অকৃত্রিমতা হারাইয়া কৃত্রিমতা অবলম্বন করি, সত্যের পথ ছাড়িয়া দিযা অসত্যের পথে ধাবিত হই, আলো হইতে অন্ধকারে আসিযা দিশাহারা হইয়া

বেড়াই। এই অসবলতায় না যাইয়া যদি বাল্যের সেই ভাবটী অবলম্বন করিয়া থাকিতাম, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহারই উন্নতি সাধন করিতাম, যদি ভোগ বাসনার বিষয় কখনও না ভাবিতাম, যদি আশা রাক্ষসীকে কখনও মনো-রাজ্যে স্থান দান না করিতাম, যদি দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি হৃদয় মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে না পারিত, তাহা হইলে আজ এই পিশাচত্ব লাভ না করিয়া দেবত্ব লাভ করিতে পারিতাম, কিন্তু হায়। তাহা করি নাই। সরল পথে গমন না করিয়া বক্র পথে গমন করিয়াছি, সেই পথে চলিতে চলিতে সম্প্রতি এই ভীষণ কণ্টকাকীর্ণ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইযাছি—এ স্থান ঘোরতমসাচ্ছন্ন, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, পথ অন্বেষণ করিতেছি—পথ পাইতেছিনা। এই ভয়ানক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কখন কখন চকিতের মত সেই অতীতের সুখস্মৃতি অস্ফুট ভাবে মনোমধ্যে উদয় হয়; তখন ক্ষণকালের জন্য যেন পুনরায় সেই সুখে সুখী হই, সেই কেন্দ্র অভিমুখে ধাবিত হইবার চেষ্টা করি—কিন্তু—হায়। আইসে আবার চলিয়া যায়।

সম্পূর্ণ।